৩য় মত

চাই যুগোপযোগী একক শিক্ষাব্যবস্থা

আমি কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত পাঠক। ইদানীং কমপিউটার জগৎ-এর নন-টেকনিক্যাল লেখা বেশ কমে গেছে। তবে যেসব নন-টেকনিক্যাল লেখা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে কোনো কোনোটি বেশ চমৎকার এবং সংক্ষিপ্ত হলেও যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ। মনে হয়, এ ধরনের লেখা মাত্র এক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে আরো বিস্তৃত করলে আমার মতো সাধারণ পাঠকেরা নিজেদের আরো বেশি তথ্যসমৃদ্ধ করতে পারতো। এমনই একটি লেখা নভেম্বর ২০১০-এ প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল 'স্বাধীনতার ৫০ বছরে কয়েকটি দেশের প্রযুক্তি খাতের উন্নতি।' চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ লেখাটির জন্য ধন্যবাদ লেখক ও কমপিউটার জগৎ পরিবারকে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করবে ২০২১ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরে অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে সরকার 'রূপকল্প ২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণা করেছে। রূপকল্প ২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু কাজও করেছে, যা আমাদের প্রত্যাশাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু কাজ হলেও তার আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ বা সুবিধা আমরা কখনোই পাবো না। বিশেষ করে যদি শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্বলতা থাকে। বিস্ময়কর হলেও এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিরা বলা যায় একদম নির্বিকার।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উদাসীনতা রয়েছে যথেষ্ট মাত্রায়। আমরা জানি, এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এখন বিশ্বের শীর্ষ ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় নেই। এশিয়ার ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রকৌশল শ্রেণীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ৭২তম। যদি দিন দিন শিক্ষার মান না কমতো, তাহলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

আমরা যদি সত্যি সত্যি 'রূপকল্প ২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সফল বাস্তবায়ন চাই, তাহলে অবশ্য আমাদের দেশে প্রচলিত বহুধারার শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে নতুন ধারার আধুনিক এবং একটি জাতীয় চেতনাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা খুবই জরুরি। অন্যথায় আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় ক্রমশ আরো পিছিয়ে যেতে থাকব। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টানোর কথা মাঝেমধ্যে বেশ জোরেশোরে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে শোনা গেলেও স্কুল পর্যায়ের বহুধারার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা খুব কমই শোনা যায় এসব সভা-সেমিনারে। অথচ স্কুল পর্যায়েই শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উপযুক্ত সময়। গোড়ার গলদ রেখে কোনোভাবে আমরা যথাযথভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষায়-শিক্ষিত হতে পারবো না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাটি হতে হবে যুগোপযোগী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থাটি অবশ্যই হবে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং এ বিষয়টিকে এখন থেকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কাজ করলে 'রূপকল্প ২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক এক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

নাজমুল হুদা
নালিতাবাড়ী, শেরপুর

আইসিটি সংগঠন ও শিক্ষাবিদদের সমন্বিত উদ্যোগ

আমরা অনেকেই জানি, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে নব্বইয়ের দশক থেকে এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। সে সময়ে মনে করা হতো, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার ঘটলে দেশের বেকারত্বের হার বেড়ে যাবে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, সরকারি নীতিনির্ধারক মহলও মনে করতো তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হলে তাদের ক্ষমতাও লোপ পাবে। এমনই এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ও বেসিস নামের তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট দুটি সংগঠন। বলা যেতে পারে, মূলত এ দুটি সংগঠনের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই এদেশের জনমনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি ভীতি দূর হতে থাকে।

বিসিএস সংগঠনটি মূলত প্রযুক্তিপণ্যসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশে প্রচুর পরিমাণে নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য আমদানি করতে হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। অন্যদিকে বেসিসের ব্যবসায়িক কার্যক্রম মূলত সফটওয়্যারনির্ভর। এ সংগঠনটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রির মাধ্যমে। বিদেশে সফটওয়্যার পণ্য তৈরি ও সেবা রফতানির মাধ্যমে এ সংগঠনটি বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বেশি আয় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধারা প্রতি বছরই বাড়ছে।

লক্ষণীয়, আমাদের দেশে যেসব সফটওয়্যার তৈরি হয়, তার জন্য পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় আমদানি করা হার্ডওয়্যারের ওপর। হার্ডওয়্যার ছাড়া সফটওয়্যারের কথা ভাবাই যায় না। অর্থাৎ বিষয়টি হলো হার্ডওয়্যার ছাড়া সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তা আমাদের দেশের সবাই যেমন জানে না, তেমনি জানে না এ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো। কিন্তু, আমার কাছে মনে হয় এ বিষয়টি বেসিস ও বিসিএস উভয় মানে না।

হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া এ শিল্প খাতের অস্তিত্বই থাকতো না। একটি ছাড়া অপরটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। অথচ আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট সংগঠন দু'টি ভিন্ন ভাবধারায় চালিত হচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই মনে করে, এদেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশে এবং দেশের অর্থনীতিতে শুধু তাদের নিজেদের ভূমিকা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উভয় সংগঠনই আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত। এক সংগঠন আরেক সংগঠনের সাফল্যে প্রচণ্ডভাবে ঈর্ষান্বিত। শুধু তাই নয়, কেউ কারো প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনেও কার্পণ্য করে। সহজ ও ভদ্র ভাষায় বলা যায়, তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই। আবার অপরদিকে আইসিটিসংশ্লিষ্ট শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ খাতের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখে না, জানতে চায় না শিল্প খাতে চাহিদা কী? দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইসিটিসংশ্লিষ্ট গ্র্যাজুয়েট তৈরির ক্ষেত্রে শিল্প খাতের চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সময়ের সাথে তথা যুগের চাহিদার সাথে নিজেদের ও তাদের ছাত্রদের আপগ্রেড করতে গররাজি বা অক্ষম।

এমনই অবস্থার মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের আইসিটি খাত। এ খাতের যথাযথ উন্নয়ন প্রত্যাশা করলে অবশ্য বিসিএস, বেসিস ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

চঞ্চল চৌধুরী
সাতমাথা, বগুড়া

সম্ভাবনাময় পেশা ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সিংয়ে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত হাঁটি হাঁটি পা পা করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের দেশও ফ্রিল্যান্সিংয়ে অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে। তরুণদের কাছে এর ব্যাপকতা দিন দিন বাড়ছেই। আর ঘরে বসেই আয় করা যায় বলে বর্তমানে প্রযুক্তিসচেতন ব্যক্তিদের কাছে রয়েছে এর একটা আলাদা কদর। বর্তমানে বিভিন্ন পত্রিকা এবং মিডিয়া মাধ্যমে 'অনলাইনে আয়' সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালার বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে এবং এসব ক্ষেত্রে দেয়া হচ্ছে অনেক লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা। কেউ কেউ তাদের নির্ধারিত কোর্সের প্রথম থেকেই আয়ের গ্যারান্টি দিচ্ছে, কেউবা একেবারে ফ্রি কর্মশালার আয়োজন করছে, অবশ্য পরে তাদের নির্ধারিত একটা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও 'আগে এলে আগে' ভিত্তিতে অর্থাৎ আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই সিট বুকিং দিতে হচ্ছে। আমাদের আজকের বিজ্ঞ বা দক্ষ ফ্রিল্যান্সাররা অনেক কষ্ট করেই বাংলাদেশকে আজ ফ্রিল্যান্সিংয়ে সম্ভাবনাময় করে গড়ে তুলেছে। তাদের এই কষ্ট করা মানেই আমাদের নবীন ফ্রিল্যান্সারদের ভবিষ্যতের পথ সহজ ও সুগম হওয়া। কিন্তু দেড় থেকে দুই ঘণ্টার একটা কর্মশালা কিভাবে একজন প্রযুক্তিপ্রেমীকে বা একজন ব্যক্তিকে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলবে এবং তার পর পরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করার গ্যারান্টি দিচ্ছে ব্যাপারটি আমার কাছে বোধগম্য নয়। কমপিউটার জগৎ ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনটি গাইডলাইন হিসেবে ধরে নিলেও একজন ব্যক্তির ফ্রিল্যান্সার হতে মোটামুটি কিছুটা সময় লেগে যাবে। একজন ব্যক্তিকে ফ্রিল্যান্সার হতে হলে এবং ফ্রিল্যান্সার হিসেবে মোটামুটি ভালোমানের অর্থ আয় করার জন্য দেড়-দুই ঘণ্টার একটি লোভনীয় কর্মশালাই কি যথেষ্ট? নাকি আমরা নতুনরা সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে ভুল পথে পা দিচ্ছি? এ ব্যাপারে মতামতের জন্য কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরিশেষে কমপিউটার জগৎ-এর সব পাঠক, প্রযুক্তিপ্রেমী ও ফ্রিল্যান্সারদের শুভ কামনায় কমপিউটার জগৎ-এর এক অকৃত্রিম ভক্ত।

শুভ
রামপুরা, ঢাকা